পশুপক্ষী
পালন ও চিকিৎসা

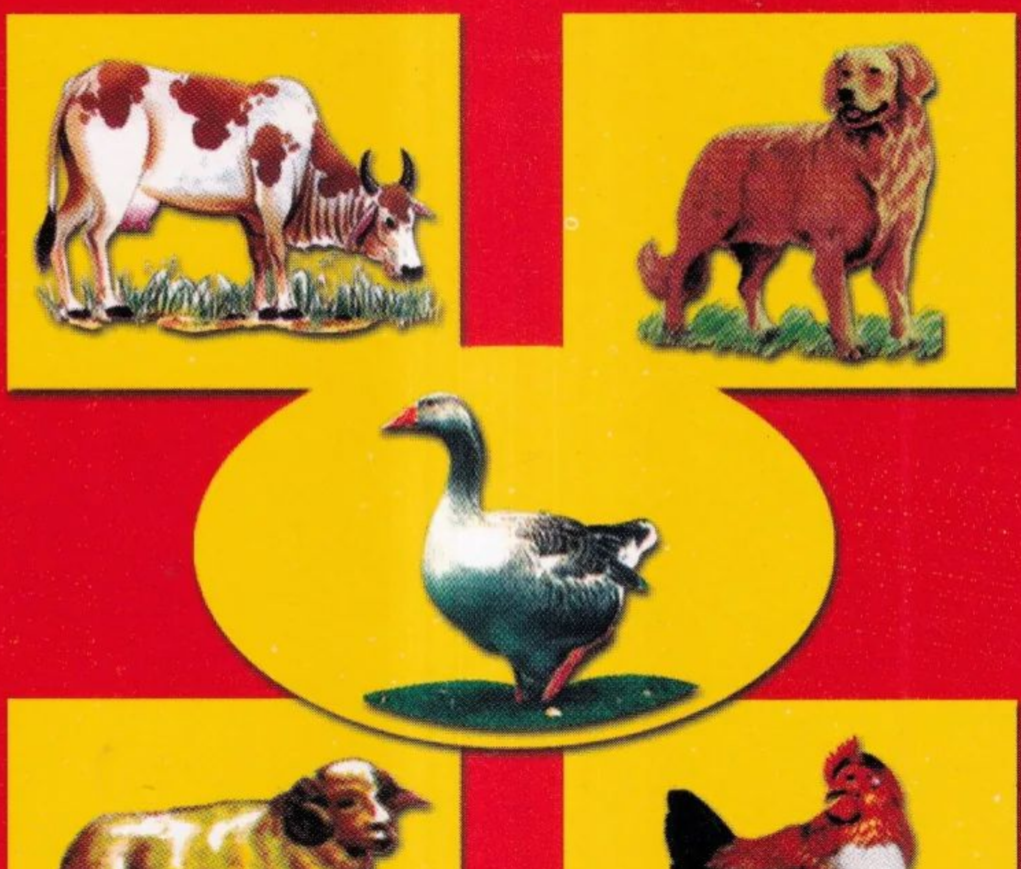

ডাঃ ইউ. কে. চ্যাটার্জী

সূচীপত্র

বিষয় .... পৃষ্ঠা
হাঁস ও মুরগী ২
হাঁস মুরগীর খাদ্য ৪
বাচ্চা মুরগীর খাবারের উপাদান ৪
বাড়ন্ত বাচ্চার খাবারের পরিমাণ ৫
ডিম দেওয়া মুরগীর খাবারের পরিমাণ ৬
সংক্রামক রোগ ৮
অসংক্রামক রোগ ৯
সংক্রামক রোগের হাত থেকে হাঁস-মুরগীকে রক্ষা করার নিয়মাবলী ৯
কয়েকটি বিশেষ রোগ ও তার চিকিৎসা ১০
মুরগীর সাদা পায়খানা বা পুলোরাম ও লক্ষণ ১৩
বিভিন্ন প্রকার অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ও ভিটামিনের ব্যবহার বিধি ৩৯
মুরগী সম্বন্ধে বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য ৪৭
ব্রয়লার পালনের নিয়ম ৫২
পশুপালন ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি ৫৫
পশুপালন সাধারণ নিয়মাবলী ৫৭
গৃহপালিত পশু বাসস্থান ৫৮
পানীয় জল ও জল সরবরাহ ৬০
পশুর পরিচ্ছন্নতা ও রোগ জীবাণু শূন্যকরণ ৬৩
রোগ সংক্রামন প্রতিরোধ ৬৪
গরু ও তার গর্ভাবস্থা ৬৬
নবাগত বাছুরের যত্ন ৬৭
বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের গুণাবলী ও কাজ ৬৯
বাছুরের খাদ্য ৭৩
ছাগলের খাদ্য ও প্রসব ৭৪
শুয়োরের খাবার ৭৫
কুকুর ও ভেড়ার খাবার ৭৬
পশু পাখীর নানা প্রকার রোগ ও তার চিকিৎসা ৭৭
বাছুরের চক্ষু প্রদাহ ও ধনুষ্টংকার ৮৫
গাভীর বাঁটে ঘা, রিকেটস্‌ ৮৬
পশুর ঋতু ৮৯
জন্তু-জানোয়ারদের গর্ভ পরীক্ষা করার পদ্ধতি ৯০
পশুপক্ষীদের বিভিন্ন রোগ এবং চিকিৎসা ৯৫
চর্মরোগ ৯৫
একজিমা ৯৮
চুল উঠে যাওয়া বা টাক পড়া ৯৮
দাদ ৯৯

বিষয় .... পৃষ্ঠা
আঁচিল ৯৯
পাঁচড়া ১০০
এসোঁ বা খুড়ো রোগ ১০০
বিসর্প ১০২
কাউর ঘা ১০৩
বাত রোগ ১০৪
উদরাময় ১০৬
অস্থিভঙ্গ ১০৮
হাড়ের স্থান চ্যুচি ১০৯
আঘাত ১১০
কীট পতংগাদির দংশন ১১১
সর্পাঘাত ১১১
ক্রিমি ১১১
পশু পাখিদের পেটে জল জমা ১১৭
শোথ ১২৩
আমবাত ১২৯
কোষ্ঠকাঠিণ্য ১৩৬
কাশি ১৪৪
ঘুংড়ি কাশি ১৪৮
শ্বাসনালীর রোগ ১৫০
কর্ণিয়ার ক্ষত ১৫৩
কানের রোগ ১৫৭
চোখ উঠা ১৬০
রক্ত আমাশয় ১৬১
যকৃতের প্রদাহ ১৬২
কামলা বা ন্যাবা (জণ্ডিস) ১৬৪
কার্ডুয়াস মেরিয়ানাস ১৬৫
বসন্ত রোগ ১৬৭
বহুমুত্র রোগ ১৬৯
নিউমোনিয়া ১৭৩
ধনুষ্টংকার ১৭৮
শূলবেদনা ১৮১
ডিপথিরিয়া ১৮২
জলাতংক রোগ ১৮৫
জ্বর ১৮৬
হাঁপানি ১৮৭
যক্ষ্মারোগ ১৮৭

হাঁস ও মুরগী

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য নানা প্রকার পথে উপার্জনের চেষ্টা করে চলেছে। এই উপার্জ্জনের একটা বিশেষ মাধ্যম হল হাঁস-মুরগী পালন। হাঁস-মুরগীর ডিম, মাংস প্রভৃতি বিক্রি করে এদেশের বহু মানুষ জীবিকা— নির্বাহ করে চলেছে। হাঁস-মুরগী পালন যেদিন থেকে সাধারণ মানুষের কাছে লাভজনক হয়ে উঠেছে, সেদিন থেকে বহু মানুষ এই পদ্ধতিকে জীবিকা— নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে মেনে নিয়েছে। ফলে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সুস্থ অবস্থায় হাঁস-মুরগী বাঁচিয়ে রাখার ও তার নানা রকম রোগ চিকিৎসার।

সুস্থভাবে হাঁস-মুরগী বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হাঁস-মুরগীর খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। প্রয়োজন মত হাঁস-মুরগীকে সুষম খাদ্য যোগান না দেওয়া হলে হাঁস-মুরগীর শরীর সবল হয় না এবং ডিমও ভাল দেয় না। এ ছাড়া উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে হাঁস-মুরগীর বাচ্চার দেহের বাড় ভালো হয় না এবং পরে ঐ বাচ্চাও ডিম বেশি দিতে পারে না।

হাঁস-মুরগীর সুষম খাদ্যের জন্যে প্রায় চল্লিশ প্রকারের পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। এদের মোট ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যথা, শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও জল। এই খাদ্যগুলির গুণাগুণ অবশ্যই জানা প্রয়োজন যথা –

(ক) শর্করা — চাল, গম, ভুট্টা, যব, ওট প্রভৃতির ভিতর প্রচুর পরিমাণে শর্করা পাওয়া যায়। শর্করা জাতীয় খাদ্য শরীরের তাপ যোগায় ও শক্তি বাড়ায়। এই জাতীয় বস্তুর পরিমাণ খাদ্যে বেশি হলে শরীরে চর্বির পরিমাণে বেড়ে যায়। ব্রয়লার জাতীয় মুরগীকে এই কারণে এই জাতীয় খাদ্য বেশি পরিমাণে বেড়ে যায়। ব্রয়লার জাতীয় মুরগীকে এই কারণে এই জাতীয় খাদ্য বেশি পরিমাণে খাওয়ানো হয়ে থাকে। এক গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য থেকে প্রায় ৪.১ ক্যালারি তাপ পাওয়া যায়।

(খ) প্রোটিন — প্রোটিন জাতীয় খাদ্য শরীরের মাংস পেশীর গঠন ও শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে সাহায্য করে থাকে। প্রোটিন জাতীয় দুটি উপাদান থেকে পাওয়া যায়। যথা –

(i) জৈব উপাদান বা জৈব প্রোটিন।

(ii) উদ্ভিদ উপাদান বা উদ্ভিদ প্রোটিন।

(i) **জৈব প্রোটিন** — যে সমস্ত প্রোটিন প্রাণীজ উপাদান থেকে পাওয়া যায় তাই জৈব প্রোটিন। যেমন, মা, মাংস, ডিম প্রভৃতি।

(ii) **উদ্ভিদ প্রোটিন** — যে সমস্ত প্রোটিন উদ্ভিদজ উপাদান থেকে পাওয়া যায় তাই উদ্ভিদজ প্রোটিন। যেমন, ডাল জাতীয় দানা শস্য, বাদাম খইল, তিসি খইল প্রভৃতি।

এই দুই প্রকারের প্রোটিন মুরগীর খাবারে বা ম্যাশে উপযুক্ত পরিমাণে থাকা

প্রয়োজন। বাচ্চা মুরগীর ম্যাশে শতকরা ২০ ভাগ ও ডিম পাড়া মুরগীর ম্যাশে শতকরা ১৬ ভাগ প্রোটিনের প্রয়োজন।

(গ). **ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাদ্য** — তেল, ঘি, মাখন প্রভৃতি ফ্যাট জাতীয়. খাদ্য বস্তু। ফ্যাট শরীরে তাপের যোগান দিয়ে থাকে। ফ্যাট জাতীয় খাদ্যে ভিটামিন এ. ডি. ই প্রভৃতি মেশানো থাকে। ফ্যাট জাতীয় খাদ্য শরীরের শক্তি যোগানের একটি উৎস। এক গ্রাম ফ্যাট থেকে প্রায় ৯.৩ ক্যালরি তাপ পাওয়া যায়।

হাঁস-মুরগীর খাদ্যে আলাদা ভাবে ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয় না কারণ শরীরের বাড়তি শর্করা ফ্যাট হয়ে শরীরে তাপের যোগান দিয়ে থাকে।

(ঘ) **খনিজ লবণ** — শরীরের বৃদ্ধি এবং ঐ বৃদ্ধি রক্ষার জন্য খাদ্যে খনিজ লবণের অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস উপযুক্ত পরিমাণে না থাকলে শরীরের হাড় পুষ্ট হয় না। ম্যাঙ্গানিজ সালফেটের অভাবে মুরগীর পিরোসিন নামে এক প্রকার বিশেষ রোগ হয়ে থাকে। ম্যাঙ্গানিজ সালফেটের অভাবে মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর ক্ষমতা কমে যায়। হাঁস-মুরগীর খাবারে শতকরা দুইভাগ ক্যালসিয়াম, একভাগ ফসফরাস ও এক পাউণ্ডে এক মিলি গ্রাম ম্যাঙ্গানিজ সালফেট থাকা প্রয়োজন।

(ঙ) **ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ** — খুব সামান্য পরিমাণে হলেও হাঁস-মুরগীর খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিনের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। মুরগীর খাবারে ভিটামিন এ, বি, সি, ডি ও ই অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।

(i) **ভিটামিন-এ** — কড় মাছের তেল, দুধ, সবুজ ঘাস, গাজর, শার্কলিভার অয়েল, বাঁধা কপির পাতা, প্রভৃতি জাতীয় খাদ্য বস্তুতে ভিটামিন–এ পাওয়া যায়। হাঁস-মুরগীর দেহের বৃদ্ধি, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি, হজম বাড়ানো, ডিমের উৎপাদন বাড়ানো-প্রভৃতির প্রয়োজনে হাঁস-মুরগীর খাদ্যে ভিটামিন–এ অবশ্যই প্রয়োজন। এ ছাড়া ভিটামিন–এ হাঁস-মুরগীর চোখ ভাল রাখতে, ডিম দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও প্রয়োজন হয়।

(ii) **ভিটামিন-বি** — অংকুরিত ছোলা, ঢেঁকি ছাটা চাল, মুগ প্রভৃতিতে ভিটামিন-বি পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রায় সকল শাক-সব্জি, ডাল জাতীয় সমস্ত প্রকার শস্যে ভিটামিন-বি পাওয়া যায়।

ভিটামিন স্নায়ু বা নার্ভ সতেজ রাখতে সাহায্য করে থাকে। এই ভিটামিন হাঁস-মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনের হার বাড়িয়ে দেয়।

(iii) **ভিটামিন-ডি** — ভিটামিন সাধারণতঃ হাড়ের গুঁড়ো, কড় মাছের তেল, ডিমের খোলা প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হাঁস-মুরগীর দেহের হাড় আর ডিমের খোল তৈরী করতে এই ভিটামিন খুবই সাহায্য করে থাকে। এই ভিটামিনের অভাবে হাঁস-মুরগীর রিকেট রোগ হয়ে থাকে।

(iii) **ভিটামিন-ই—** গম, ছোলা, মুগ প্রভৃতিতে ভিটামিন-ই পাওয়া যায়। হাঁস-মুরগীর প্রজনন যন্ত্র সুস্থ ও সবল রাখতে এই ভিটামিনের খুবই প্রয়োজন।

(v) **ভিটামিন-সি—** লেবু, ঘাস ও শাকসজিতে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। এই ভিটামিন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে থাকে। রক্ত ভাল রাখে। হাঁস-মুরগীর খাদ্যে এই জাতীয় ভিটামিন সাধারণতঃ থেকে যায়। ফলে পৃথকভাবে মুরগীকে এই ভিটামিন দেবার প্রয়োজন নেই।

(চ) **জল —** জলের অপর নাম 'জীবন', সুতরাং সকল জীবের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে জল অবশ্যই প্রয়োজন। এক সপ্তাহ বয়েসের একশ বাচ্চার জন্য দৈনিক প্রায় ২ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। কুঁড়ি সপ্তাহ বয়েসের একশ বাচ্চার জন্য দৈনিক ২৫-৩০ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। একটা বড় মুরগী দৈনিক প্রায় ২৫০ মিলিলিটার জল পান করে থাকে। মুরগী শীতকালে তুলনায় গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি জল পান করে থাকে। মুরগীর জল দিনে দুবার পালটে দেওয়া প্রয়োজন।

হাঁস-মুরগীর খাদ্য

হাঁস-মুরগীর খাবার খুব সহজেই ঘরে তৈরী করে নেওয়া যায় কিন্তু এই খাবার তৈরীর সময় খেয়াল রাখা প্রয়োজন খাবার যে সমস্ত উপাদান দ্বারা তৈরী করা হবে তা যেন খুব সহজেই পাওয়া যায় ও সস্তা হয়, খাদ্য তৈরীর উপাদান যেন যথেষ্ট পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হয় এবং খাদ্য যেন হাঁস-মুরগী আগ্রহের সঙ্গে খায় কারণ খাবার খারাপ হলে এরা তা খেতে চায় না ও এর ফলে এদের ডিম দেওয়া কমে যায়।

মুরগীর খাবারের ভিতর ভুট্টার দানা, গমের দানা, গমের ভূষি, চালের কুঁড়ো, বাদামের খোল, তিসির খোল, শুকনো মাছ, সাধারণ লবণ, খনিজ লবণ ও ভিটামিন, এই জাতীয় খাদ্য সামান্য শুকনো বা ভিজিয়ে দেওয়া চলে।

বাচ্চা মুরগীর খাবারের উপাদান : —

১। ভুট্টার গুঁড়ো	৩০%
২। গমের গুঁড়ো	২০%
৩। গমের ভূষি	১৫%
৪। মাছের গুঁড়ো	১১%
৫। ঝিনুকের গুঁড়ো	১%
৬। খনিজ লবণ	২.৫%
৭। লবণ	০.৫%
৮। গুঁড়ো দুধ	০.৫%
	মোট ১০০%

উপরের খাদ্য উপাদানের সঙ্গে মেশাতে হবে ভিটাব্লেন্ড এ-বি ২ ডি-৩ প্রতি টনে দু'শ গ্রাম।

বাচ্চাদের খাবারের পরিমাণ কতটা হবে তা নির্ধারিত হবে বাচ্চার বয়েসের উপর যেমন

আট সপ্তাহ পর্যন্ত বয়েসের একশ বাচ্চার খাবারের পরিমাণ : —

১ম সপ্তাহ	৭ কিলোগ্রাম
২য় সপ্তাহ	১৩ কিলোগ্রাম
৩য় সপ্তাহ	১৯ কিলোগ্রাম
৪র্থ সপ্তাহ	২৬ কিলোগ্রাম
৫ম সপ্তাহ	৩২ কিলোগ্রাম
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	৪০ কিলোগ্রাম
৭ম সপ্তাহ	৪৫ কিলোগ্রাম
৮ম সপ্তাহ	৪৮ কিলোগ্রাম

বাড়ন্ত বাচ্চার খাবারের পরিমাণ : —

উপাদানের নাম	শতকরা পরিমাণ
১। ভুট্টা	২০%
২। চালের কুঁড়ো	১০%
৩। গমের ভূষি	১০%
৪। বাদামের খোল	৩০%
৫। মাছের গুঁড়ো	৬%
৬। ঝিনুকের গুঁড়ো	২%
৭। গম	২০%
৮। লবণ	২০%
৯। খনিজ লবণ	১%

হাঁস-মুরগীর বাচ্চার বাড় খুব বেশি হয় প্রথম দু'মাস বয়েসে। এই কারণে এই সময়ে খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি রাখার প্রয়োজন হয়।

ডিম দেওয়া মুরগীর খাবারের পরিমাণ : —

উপাদানের নাম	শতকরা পরিমাণ
১। ভুট্টা	৩০%
২। গম	১৫%
৩। গমের ভূষি	১৫%
৪। চালের কুঁড়ো	৫%
৫। বাদাম খোল	২০%
৬। মাছের গুঁড়ো	১০%
৭। ঝিনুকের গুঁড়ো	২%
৮। খনিজ লবণ	২%
৯। লবণ	১%

এর খাদ্য উপাদানগুলির সাথে রোভিমিক্স এবি - ২, ভি-ত নামক ঔষধ মিশিয়ে নিতে হবে। ওষুধের পরিমাণ সাধারণতঃ এক টনে দু'শ গ্রাম।

সাধারণতঃ একটি বয়স্ক ডিম পাড়া মুরগী দৈনিক প্রায়খাবার খাবে।

হাঁস-মুরগীর রোগ ও তার থেকে রেহাই পাবার উপায় ঃ

এদেশের বহু লোকই হাঁস-মুরগী পালন করে হাল ছেড়ে দেয় এর কারণ হচ্ছে পাখীর নানা রকম রোগে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয় বলে। তখন এই জাতীয় পালন লোকসানের কারবার হয়ে দাঁড়ায়। তবে কতকগুলো নিয়ম ঠিকভাবে পালন করলে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

এই জাতীয় পাখীদের রোগ দু'রকমের হয়ে থাকে। এক রকম রোগ হল সংক্রামক। আর এক রকম হল সংক্রামক নয় এমন রোগ। সংক্রামক রোগ এদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এই রোগের ফলে খুব তাড়াতাড়ি বিপদ দেখা দেয়। রোগ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে প্রাথমিকভাবে কতকগুলো বিষয় জানা প্রয়োজন। যেমন,

হাঁস-মুরগীর বাচ্চার বয়স এক-দু'দিন হবার পরই বাচ্চাগুলিকে ভ্যাক্সিন দেওয়া প্রয়োজন। এই ভ্যাক্সিনের নাম হল 'এফ্ট্রেইন ভ্যাক্সিন বা কুলার ভ্যাক্সিন'। কয়েক প্রকার সংক্রামক রোগ ঠেকাবার জন্য এই জাতীয় ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়ে থাকে। ভ্যাক্সিন ড্রপারে করে নাকের ফুটোর মধ্যে ফেলে দেওয়া ফোঁটা ভ্যাক্সিন নাকে ফেললেই বাচ্চা তা নিজে থেকে টেনে নেয়। ভ্যাক্সিন দেবার সময় খেয়াল রাখা প্রয়োজন যাতে বাচ্চার কোন কষ্ট না হয়।

প্রথমে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসার পর প্রথম ছত্রিশ ঘণ্টায় বাচ্চার কোন খাবার বা ওষুধের প্রয়োজন হয় না। এর পর জলে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে তা খেতে দেওয়া হয়।

জন্মের ছত্রিশ ঘন্টা পর এক ভাগ গুঁড়ো দুধে দশ ভাগ জল মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। দুধের মধ্যে পাউরুটির টুকরো দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য রুটির টুকরোগুলো দুধ থেকে তুলে নিয়ে নিংড়িয়ে দুধ বার করে তবে তা দেওয়া হয়। বাচ্চা যাতে ঠিক ভাবে পায়খানা করে সেই দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এই কারণে বাচ্চাদের ভালো কাগজের উপর ভুট্টার গুঁড়ো ছড়িয়ে খেতে দেওয়া হয়। এই সময় চালের খুদ অথবা গমের টুকরো খাওয়ালে বাচ্চার পায়খানা আটকিয়ে যেতে পারে।

বাচ্চাকে ওষুধ মেশানো জল দেওয়া প্রয়োজন। বাচ্চা যাতে ওষুধ মেশানো জল ছাড়া অন্য কোন জল খেতে না পায় তার প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে ওষুধটি জলে মেশানো হয়ে থাকে সেটি হল, টেরামাইসিন-পোলট্রি ফরমূলা উইথ এনটিজারণ। এটি পাউডার জাতীয় ঔষধ। ১ চামচ এই পাউডার চার লিটার জলে মিশিয়ে সেই জল বাচ্চাদের পান করতে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথম সপ্তাহে বাচ্চাকে প্রতি দুই ঘন্টা পর-পর খেতে দেওয়া হয়ে থাকে। তিন দিন বয়স থেকে বাচ্চাদের চিকম্যাশ নামক খাবার দেওয়া হয়। এই খাবারের সঙ্গে 'নেফটিন - ৫০' নামক একটি ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এক কিলো খাবারের সঙ্গে আট গ্রাম 'নেফটিন ৫০' মিশিয়ে দেওয়া হয়।

হাঁস-মুরগীর বাচ্চার বয়স যখন ২য় সপ্তাহ হয় সেই সময় এই বাচ্চাদের এক বিশেষ ধরনের রোগ হয়ে থাকে। এই রোগের নাম ককসিডিওসিস। এই ঠেকাবার ব্যবস্থা অবশ্যই করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই রোগ দেখা দিলে বাইফুরান সলুল নামক ১টি ট্যাবলেট চার লিটার জলে মিশিয়ে বাচ্চাদের পান করতে দেওয়া হয়। এইভাবে ৩/৪ দিন বাইফুরান ট্যাবলেট দেওয়া হয়ে থাকে। এইভাবে চিকিৎসা করা হলে বাচ্চাদের ককসিডিওসিস জাতীয় রোগ হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

২য় সপ্তাহ বয়স থেকে বাচ্চাদের চিক্সম্যাশ খেতে দেওয়া হয়। চিক্সম্যাশ সঠিকভাবে প্রস্তুত না হলে অর্থাৎ চিক্সম্যাশের খাদ্যগুণ সঠিক না হলে বাচ্চার দেহ সঠিকভাবে বাড়ে না ও বাচ্চার হাড়ের গঠন ভাল হয় না। চিক্সম্যাশে শতকরা ২০% শতাংশ প্রোটিন থাকা প্রয়োজন। চিক্সম্যাশ ভুট্টার গুঁড়ো, শুকনো মাছের গুঁড়ো, বাদামের খোল, গমের ভূষি, গমের গুঁড়ো, চালের কুঁড়ো, লবণ, খনিজ লবণ প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। চিক্সম্যাশের মধ্যে ঝিনুকের গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, এর ফলে বাচ্চার হাড় মজবুত হয়। কারণ ঝিনুকের গুঁড়োতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। এছাড়া এই জাতীয় ম্যাশে ভিটামিনের প্রয়োজন।

হাঁস-মুরগী বাচ্চাদের জলের সঙ্গে মিশিয়ে ভিটামিন দেওয়া হয়ে থাকে। বাজারে 'রাভসল' নামক এক জাতীয় কিনতে পাওয়া যায় এই 'রাভসল' নামক ভিটামিন জলের

সঙ্গে মিশিয়ে হাঁস-মুরগীর বাচ্চাকে দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এক সপ্তাহ বয়েসের বাচ্চাদের দশ মিলিমিটার রাভসল ১/২ লিটার জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। দুই থেকে চার সপ্তাহ বয়েসের বাচ্চাদের ১ লিটার জলে ১৫ মিলিলিটার রাভসল মিশিয়ে ঐ জল পান করতে দেওয়া হয়। দেখা গেছে যে, রাভসল বাচ্চাদের খাওয়ানো হলে তাতে বাড়ন্ত বাচ্চার দেহের হাড়ের গঠন ভাল হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয়। চার সপ্তাহ বয়স থেকে বাচ্চাদের শাক সব্জি কুচিয়ে খেতে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ এক্ষেত্রে পালং, লেটুশ, নটেশাক প্রভৃতি ব্যবহার হয়ে থাকে। এই চার সপ্তাহ বয়স থেকে বাচ্চাদের পাথর কুচি বা ঝিনুকের খোলার খেতে দেওয়া যেতে পারে। পাথর কুচি ও ঝিনুকের গুঁড়ো হজম শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে থাকে।

বাচ্চাদের বয়স সাত সপ্তাহ হলে তখন ক্রিমির ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ "পাইপারেজিন এ্যাডিপেটে" নামক ওষুধ দেওয়া থাকে। এককিলো গ্রাম পাখির জন্য ০.২৫ গ্রাম ওষুধ দেওয়া থাকে। এইভাবে যেখানে পাখির ওজন বেশি সেখানে ওষুধের মাত্রা ওজন অনুসারে বৃদ্ধি পাবে।

এই জাতীয় পাখিদের ক্ষেত্রে রাণীক্ষেত রোগ ভয়ানক, কারণ এই রোগে প্রচুর বাচ্চা মারা যায়। এই কারণে ৮ সপ্তাহ থেকে ১০ সপ্তাহ বয়েসের ভিতর রানীক্ষেত রোগের টীকা অবশ্যই দেওয়া হবে। এই টীকা নেবার পর কিছু-কিছু হাঁস-মুরগীর বাচ্চার পা খোঁড়া হয়ে যেতে অথবা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে ভয় পাবার কিছু নেই। এই জাতীয় লক্ষণ দেখা দিলে ম্যাকরা বেরিন অথবা বেরিন ট্যাবলেট খাওয়ালে উপকার পাওয়া যাবে। এই ট্যাবলেট সাধারণতঃ দৈনিক একটি করে মোট সাতদিন খাওয়াতে হয়, দৈনিক একটি করে।

হাঁস-মুরগীর বাচ্চাকে সুস্থভাবে বড় করতে হলে কতকগুলি বিষয়ের উপর অবশ্যই নজর রাখা প্রয়োজন। যেমন,

(১) বাচ্চা হতে হবে নীরোগ, সুস্থ ও সবল।

(২) বাচ্চার থাকার জায়গা হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

(৩) জল এবং খাবার থাকবে পরিষ্কার।

(৪) পরিচর্যা ব্যবস্থাটি হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

সংক্রামক রোগ — প্রাণীর দেহে কিছু-কিছু পরজীবী বাস করে যারা আশ্রয়দাতাকে শুষে নিয়ে বেঁচে থাকে। এই পরজীবিদের মধ্যে কতকগুলিকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। আবার কতকগুলিকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না। এই জাতীয় পরজীবি দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এর এক রকম উদ্ভিদ জাতীয়, এদের ব্যাকটিরিয়া বলা হয়। আর একরকম হচ্ছে প্রাণী জাতীয়। যেমন প্রটোজোয় নামের জীবাণু। এছাড়াও আছে ভাইরাস ঘটিত সংক্রমক রোগ।

সাধারণতঃ মুরগীর ক্ষেত্রে সংক্রামক রোগ গুলির মধ্যে রানীক্ষেত, কলেরা, বসন্ত এবং বাচ্চা মুরগীর পুলোরাম বা ককসিডিওসিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রোগ হয়েছে এই জাতীয় মুরগীর মল, কফ, দূষিত খাবার ও জল থেকে আসে কোরাইজা রোগ। বাতাস থেকে আসে ভাইরাস। এছাড়া নানারকম পশু-পাখি ও মানুষ মুরগীর খামারে নানা রকমের রোগ জীবাণু বহন করে নিয়ে আসে।

অসংক্রামক রোগ ঃ —

ভিটামিনের অভাবে হাঁস-মুরগীর নানা প্রকারের রোগ হয়। এইগুলির মধ্যে মুরগীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল রুপ, পিরোসিস, রিকেট জাতীয় রোগ। মুরগীর ক্ষেত্রে আঁশ আছে এই জাতীয় ঘাস পাতা খেলে ক্রপ বাউণ্ড হয়। মুরগীর চরে বেড়াবার জায়গা সমতল না হলে বাম্বলফুট নামে এক জাতীয় রোগ হতে পারে। গরমে অথবা মুরগী খুব বেশী পরিমাণে খেলে এপাপ্লেকাস রোগ হয়ে থাকে।

সংক্রামক রোগের হাত থেকে হাঁস-মুরগীকে রক্ষা করার নিয়মাবলী ঃ—

কয়েকটি নিয়ম সঠিকভাবে পালন করা হলে হাঁস-মুরগীর সংক্রামক রোগ কিছুটা কমিয়ে আনা যায়। যেমন,

(১) মুরগীর খামারের জমি শুকনো রাখা প্রয়োজন। মুরগীর লিভার শুকনো থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। মুরগীর খামারের জমি লিভার শুকনো থাকলে ক্রিমির ডিম বাঁচতে পারে না। সেক্ষেত্রে মুরগীর ক্রিমির দ্বারা রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়।

(২) হাঁস-মুরগীকে পুষ্টিকর খাবার অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন। পানীয় জল হবে টাট্‌কা, শীতল ও পরিষ্কার। মুরগীর ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এই কারণে খাদ্য বস্তু ও পানীয় জলে ছত্রাক যাতে না থাকে সেই বিষয়ে খেয়াল রাখা অবশ্যই প্রয়োজন।

(৩) হাঁস-মুরগীর বাসস্থান অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। খাবার দেওয়ার ও জল দেবার পাত্র দৈনিক পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

(৪) হাঁস-মুরগী যেখানে থাকবে সেই স্থানে যাতে অবাধে বাতাস চলাচল করতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঘরে আলোর যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(৫) বিশেষতঃ জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ বাইরের কোন লোককে পাখির ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। যেখানে মুরগী থাকে সেই ঘরের সামনে তাজা চুন রেখে